থ্রিজি চালুর অঙ্গীকার রক্ষা করুন

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশ সরকারের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন রাজু ২০১২ সালের মাঝেই থ্রিজির লাইসেন্স দেয়ার অঙ্গীকার করেন। গত ২৪ জুন জাতীয় সংসদে তিনি এই অঙ্গীকার করেন। ২৪ জুন রাতে প্রচারিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজিউদ্দিন রাজু জানান, এখন তার মন্ত্রণালয় বিটিআরসি'র দেয়া গাইডলাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। খুব শিগগির এই গাইডলাইনটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্ট্যাক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হবে এবং এরপর সেই গাইডলাইনটি বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এই গাইডলাইন অনুসরণ করে ২০১২ সালের মাঝেই থ্রিজি প্রযুক্তির লাইসেন্স দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুতি দেন।

টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রীর সংসদীয় অঙ্গীকারের ফলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ শুধু নতুন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের যুগেই পা দিচ্ছে না বরং দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের যুগেও পা দিতে যাচ্ছে। এর আগে বিটিআরসি থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার গাইডলাইন প্রস্তুত করে সেটি অনুমোদনের জন্য রাজিউদ্দিন রাজুর মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেই পরিকল্পনা মতে, চলতি বছরের নভেম্বর মাসে ৫টি মোবাইল অপারেটরকে থ্রিজি, ফোরজি এবং এলটিই লাইসেন্স দেয়ার কথা। তবে বিটিআরসি'র গাইডলাইন অনুসারে নভেম্বরেই লাইসেন্স দেয়া যাবে কি না, তা নিয়ে এরই মাঝে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, বিটিআরসি'র গাইডলাইনটি টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না।

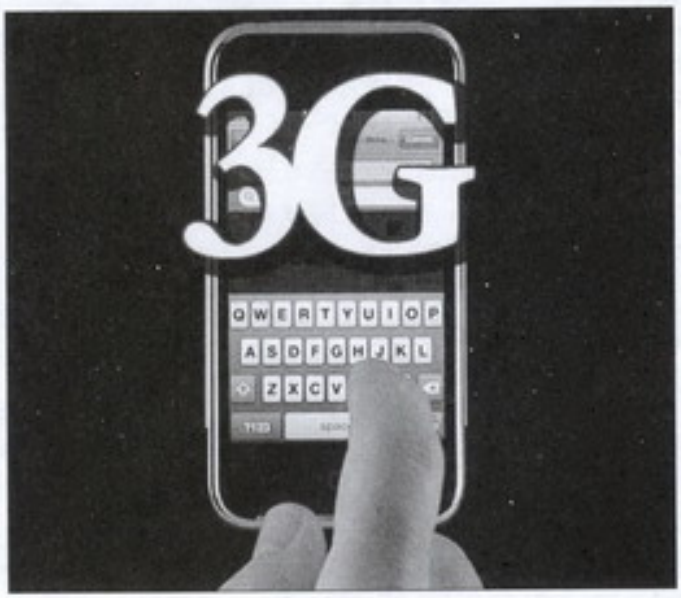

গত ৩ এপ্রিল দৈনিক সংবাদের খবরে বলা হয়, থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার জন্য প্রথমে লাইসেন্সের নিলাম হবে এবং নিলামের পর লাইসেন্স ইস্যু করা হবে। লাইসেন্স দেয়ার শর্ত হিসেবে লাইসেন্স ইস্যুর ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে, ১৬ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে ৩০টি জেলায় এবং ৩৬ মাসের মধ্যে পুরো দেশে এই সেবা চালু করতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে, চলতি বছরের ডিসেম্বরেও যদি লাইসেন্স দেয়া হয়, তবে ২০১৩ সালের জুনের মধ্যেই বিভাগীয় শহরের মানুষ প্রথম থ্রিজির যুগে পা রাখতে পারবে। ২০১৩ সালে সব বিভাগীয় শহর এর আওতায় আসতে পারে। ২০১৫ সালের মধ্যে পুরো দেশ এই যুগে পা রাখবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্তত ছয় বছর আগেই আমরা ডিজিটাল যুগের সার্বজনীন সংযুক্তির জগতে বসবাস করব।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, থ্রিজি প্রযুক্তি চলতি শতকের শুরুতে উদ্ভব হয়। এটি দ্রুতগতির একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এর ফলে মোবাইল ফোনে কথা বলার পাশাপাশি তথ্য, ছবি ও সাউন্ড পারাপার দ্রুতগতির হয় এবং এর প্রভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ধারা গড়ে ওঠে। মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, নেটবুক ও কমপিউটারের সহায়তায় আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ খুবই সহজ ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগে পৌঁছে।

এই প্রযুক্তি প্রথমে ইউরোপে ও পরে এশিয়ার জাপান, কোরিয়াসহ উন্নত দেশগুলোতে এবং এখন আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই চালু আছে। ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মাঝে এই অঞ্চলের সব দেশেই থ্রিজি প্রযুক্তি প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দিক থেকে এটি নিশ্চয়ই ভাবার বিষয়, প্রযুক্তিগত বিষয়ে আমরা আফগানিস্তানের কাতারে থাকব কি না?

থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে দৈনিক সংবাদের খবরটির মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যায় : ক. এ ধরনের লাইসেন্স দেয়ার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে বিটিআরসি গত ২৮ মার্চ ২০১২ টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। খ. খসড়া অনুসারে চলতি বছরের ৭ মে থেকে নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। আবেদনের সময় আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত থাকার কথা ছিল। ১৯ জুলাই যোগ্য আবেদনকারীর নাম ঘোষণা করার কথা ছিল। ৩ সেপ্টেম্বর নিলাম হওয়ার কথা রয়েছে।

বিটিআরসি'র গাইডলাইন অনুসারে লাইসেন্সের আবেদন ফি ৫ লাখ টাকা এবং লাইসেন্স ফি ১০ কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। লাইসেন্সের প্রস্তাবিত নবায়ন ফি হবে বার্ষিক ৫ কোটি টাকা। রেভেনিউ শেয়ারিং ৫.৫ শতাংশ এবং সামাজিক দায় ফি শতকরা ১ শতাংশ থাকবে। মোট ৫টি লাইসেন্স দেয়া হবে। ১৫ বছরের জন্য লাইসেন্স দেয়া হবে। লাইসেন্স দেয়ার শর্ত হিসেবে এই প্রযুক্তি প্রসারের একটি সময়সীমা থাকবে, যার সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে তিন বছর।

আমরা লক্ষ করেছি, এরই মাঝে বিটিআরসি'র সময়সীমার বেশ কয়েকটি ডেটলাইন পার হয়ে গেছে। বিশেষ করে মে-জুন মাসের সময়সীমা তো অতিক্রান্ত হয়েই গেছে। জুলাই-আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের সময়সীমার পাশাপাশি এই বছরের অন্য যেসব সময়সীমা রয়েছে, সেগুলোও মেনে চলা হবে কি না সেটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু আশার আলো হচ্ছে, জাতীয় সংসদে মন্ত্রী ২০১২ সালের সময়সীমাটি ঘোষণা করেছেন এবং এটি মেনে চলা হলেও থ্রিজির জন্য আমাদের পিছিয়ে পড়াটা তত বেশি হবে না।

তবুও প্রথমত বিটিআরসিকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত এমন একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। যদি প্রস্তাবনা অনুসারে এরা কাজটি সম্পন্ন করতে পারে, তবে আমরা তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। তবে আমরা ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। ১৯৯২ সালে আমাদের যে সাবমেরিন ক্যাবল পাওয়ার কথা ছিল সেটি আমরা ২০০৬ সালে পেয়েছি। এরই মাঝে আমাদের যে বিকল্প সাবমেরিন সংযোগ পাওয়ার কথা, সেটি এখনও পাইনি। এমনকি যে টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ হয়েই গেছে বলে প্রচারিত হচ্ছে, সেটিও এখনও কার্যকর হয়নি। যে দেশটি ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তার জন্য এমন অবস্থা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা আমাদের হাত গুটিয়ে বসে আছি। জানিনা বর্ণিত তারিখ ও হিসাবগুলো সবই আবার ওলটপালট হয়ে যাবে কি না। হতে পারে, বিটিআরসি যেসব অঙ্ক নির্ধারণ করেছে তা ঠিক থাকবে না বা সেই অঙ্ক নির্ধারণ বা অন্য কোনো অজুহাতে যেসব সময় বিটিআরসি নির্ধারণ করেছে তাও ঠিক থাকবে না। টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় থেকে হয়তো বিটিআরসির প্রস্তাবনাকে আবার পর্যালোচনা করার জন্য বলা হবে। আমরা কেনো জানি এমন গন্ধ পাচ্ছি, থ্রিজি যাতে যথাসময়ে বা দ্রুত চালু না হয় তার জন্য কারও না কারও প্রয়াস রয়েছে এবং এই কাজটি বছরের পর বছর ধরেই ঝুলে আছে। যদি সংশ্লিষ্ট লোকজনকে বলা হয়, কেনো দেরি হচ্ছে, তবে আমাদেরকে বলা হবে, এটি কি সোজা কাজ? এসব কাজ করতে দেরিই হয়। কিন্তু তাদের এটি বোঝানো যায় না, কয়েকজন মানুষের বিলম্বের জন্য একটি দেশ এবং একটি জাতি পিছিয়ে যায়।

টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ের এমনসব কাজকর্ম নিয়ে আমরা জাতিগতভাবে যথেষ্ট ভুগেছি এবং ভুগছি। বিদ্যমান মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স নবায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, ফি নির্ধারণ, ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো; এসব নিয়ে বুড়িগঙ্গার পানি কম ঘোলা করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত কাজগুলো হলেও যত স্বাভাবিকভাবে এসব হওয়ার কথা ছিল, তা মোটেই হয়নি। দেশে মোবাইলের প্রবৃদ্ধি আকর্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেলেও ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটির যে চরম দৈন্যদশা তার কোনো উন্নতি এখন পর্যন্ত হয়নি। দেশে দুটি ওয়াইম্যাক্স অপারেটর কাজ করলেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও কাজ করার মতো ব্রডব্যান্ড সংযোগ এখনও বিরল। ঢাকা বা বিভাগীয় শহরে ওয়াইম্যাক্স সংযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো জেলাতেও ওয়াইম্যাক্স সংযোগ দেয়া হয়। কিন্তু কোনো প্যাকেজে কী স্পিড লেখা থাকবে এবং বাস্তবে সেটি কি পাওয়া যাবে, তার কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। বরং এমন অনেক সময় থাকে যখন সাধারণত টুজি কানেকশনে যে ধরনের স্পিড থাকা উচিত, তাও পাওয়া যায় না।

এই সরকার যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় তখন আমরা থ্রিজি ২০০৯ সালে পাব বলে আশায় বুক বেঁধেছিলাম। সেটি ২০১০ বা ১১ সালেও পাইনি। সর্বশেষ ২০১২ সালের স্বাধীনতা দিবসে বিটিসিএলের থ্রিজির উদ্বোধন হবে বলে ঘোষণা পেয়েছিলাম। এরই মাঝে সেই সময় পার হয়েছে, বিটিসিএলের কোনো সাড়াশব্দও পাইনি।

চলতি বছরের জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে বিটিসিএলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা জাতীয়ভাবে লাইসেন্স দেয়ার আগেই পরীক্ষামূলকভাবে থ্রিজি চালু করার বিষয়ে একটি প্রকল্পের কাজ করছেন। এদের কাছে এই প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি পৌঁছেছে। এরা এসব যন্ত্রপাতি বসিয়ে ফেলেছেন। একজন জানিয়েছেন, এরা এমনকি থ্রিজির টেস্ট কলও করেছেন। এরা আশা করেন, যেকোনো সময়ে তাদের পক্ষে থ্রিজি চালু করা সম্ভব হবে। অবশ্য এরা স্বীকার করেন, এই কাজটি আরো আগে হওয়ার কথা ছিল।

যতটুকু মনে পড়ে, সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছিল। সংস্থার চেয়ারম্যান নিজে অতি দ্রুত থ্রিজির লাইসেন্স দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অজুহাতে তখন লাইসেন্স দেয়ার কার্যক্রমটি শুরু করা হয়নি। আশা করেছিলাম, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই এটি সবার আগে সম্পন্ন করবে। কিন্তু তিন বছরের বেশি সময় এই বিষয়টিতে আমরা শুধু হতাশাই দেখে এলাম। একটি নীতিমালা বা গাইডলাইন তৈরি করে তার ভিত্তিতে লাইসেন্স দেয়াটাই বিটিআরসি'র কাজ ছিল। দুনিয়ার অনেক দেশ এমন নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছে। দক্ষিণ এশিয়াতেও এটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও ভারত অনেক আগেই লাইসেন্স দিয়ে থ্রিজি চালু করেছে। এসব দেশ অতি দ্রুত থ্রিজির যুগে পা দিয়ে দেশকে ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সামনে এগিয়ে গেছে। এক সময়ে আমরা মোবাইল প্রযুক্তিতে এসব দেশের চেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে কোনোভাবেই পেছনে ছিলাম না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বেশি ছিল। কিন্তু থ্রিজির প্রশ্নেই আমরা প্রথম এসব দেশ থেকে পেছনে পড়ে গেলাম।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টিঅ্যান্ডটি ও বিটিআরসি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এরা ২০১২ সালে যে কাজটি করেছে সেটি যদি ২০০৯ সালে করত তবে ৫টি অপারেটর থেকে ৫০ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি এবং অন্তত ৫ কোটি টাকা করে বছরে ২৫ কোটি হিসেবে তিন বছরে আরও ৭৫ কোটি টাকার বাড়তি লাইসেন্স ফি পেত। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টিঅ্যান্ডটি ও বিটিআরসি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এরা ২০১২ সালে যে কাজটি করেছে সেটি যদি ২০০৯ সালে করত তবে ৫টি অপারেটর থেকে ৫০ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি এবং অন্তত ৫ কোটি টাকা করে বছরে ২৫ কোটি হিসেবে তিন বছরে আরও ৭৫ কোটি টাকার বাড়তি লাইসেন্স ফি পেত। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। একই সাথে সরকার রেভেনিউ শেয়ারিং পেত ৩ বছরের। এই অঙ্কের পরিমাণটা আমি জানি না। তবে এতে হাজার কোটি টাকারও বেশি হতে পারত। এছাড়া দেশের জনগণ শতকরা ১ ভাগ সামাজিক দায়বদ্ধতার টাকায় প্রযুক্তির উৎকর্ষ দেখতে পেত। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এটি তাদের কাছে জানতে চাওয়া যায় না, থ্রিজি লাইসেন্স দিতে দেরি করার ফলে জাতির প্রযুক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি যে আর্থিক ক্ষতি হলো তার দায় কার?

আমরা জানি, এসব বিষয়ে জবাবদিহিতা বলতে কিছুই আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোতে নেই। '৯২ সালে সাবমেরিন সংযোগ না পাওয়ার ফলে যে ক্ষতি হলো সে প্রশ্ন আমরা কাউকে করতে পারি না। এমনি করে নভেম্বরেও যদি আমরা থ্রিজির লাইসেন্স না পাই তবে কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না।

অথচ অর্থমন্ত্রী এবার তার বাজেট বক্তৃতাতেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের অবদান সম্পর্কে বলেছেন। দুনিয়াজুড়ে এটি মনে করা হয়, দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার যদি শতকরা ১০ ভাগ হয় তবে প্রবৃদ্ধি বাড়ে শতকরা ২ ভাগ। উন্নত দেশগুলোতে এটি ১ ভাগের ওপরে হলেও আমাদের মতো দেশে এই হার কখনো ২-এর বেশি হয়ে যায়। ফলে থ্রিজির আগমনে যতই বিলম্ব হবে, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ততই বেশি হবে।

তাই দেশের একজন অতিসাধারণ মানুষ হিসেবে আমি প্রত্যাশা করি, যত বিলম্ব হওয়ার তা হয়েছে, কিন্তু এখন বিটিআরসি যে শিডিউলটি তৈরি করেছে সেটি যেনো মেনে চলা হয়। অন্তত সংসদের মতো স্থানে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর সেটি যেনো ভঙ্গ করা না হয়। সম্ভবত এটি আমাদের অনুভব করা দরকার, স্লোগান বা বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি যদি আমরা ইন্টারনেট সভ্যতার যুগে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরি করতে না পারি, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনাআপনি হবে না। আমি বহুবার সাধারণ তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে শুনে আসছি, আর কিছু না হোক দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড এবং তার স্বল্পমূল্য যদি নিশ্চিত করা যায় এবং যদি ডিজিটাল ডিভাইস পরিচালনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তবে দেশের মানুষ নিজেরাই তাদেরকে, দেশ ও জাতিকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পৌঁছাতে পারবে। রাষ্ট্র যদি অন্তত এই সুযোগটিও সৃষ্টি না করে তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হবে। বিগত সাড়ে তিন বছরে আমাদের পথচলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ বা আশানুরূপ না হলেও অনেকটাই গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের বলে মনে হয়েছে। হতে পারত আমরা এর চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে দৌড়াতে পারতাম। আমরা থ্রিজির যুগে যেতে পারতাম আরও অনেক আগে। সেদিন অর্থমন্ত্রী দেশ টিভির এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, দুর্নীতি ও অদক্ষতার জন্য থ্রিজি চালু হয়নি। আমরা কামনা করব, অর্থমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণকে অতিক্রম করে আমরা থ্রিজির জন্য ২০১২ সালের পর আর অপেক্ষা করব না।

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com